{ গল্প }

# পূর্ণতার অভিজ্ঞান, রিক্ততার রাগিণী

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

দিবাকর ভট্টাচার্যর গল্পগুলি সময়ের সম্পাদ্য থেকে আপনাআপনি মুক্ত হয়ে মহাসময়ে পা রাখে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এই গ্রন্থ ভীষণ জরুরি সংযোজন।

বজ্রশিখার এক পলকে সাদা আর কালো
যেভাবে মিলিয়ে যায় দিবাকর ভট্টাচার্যের
কাহিনির ভিতর ঢুকে পড়তে পারলে সেভাবেই
মিলিয়ে যায় বাস্তব আর অবাস্তবের সীমারেখা।
কিংবা বলা যায়, দুই মিলিয়ে তৈরি হয় এক
অঘোরবাস্তব, যার সৃষ্টি কলমে আর বিচ্ছুরণ
অনুভবে। মহামিলন মন্দিরে ঈশ্বরেরও
স্বেচ্ছাচার চলে না বলে কথিত আছে,

**তথাগত মুখশ্রীটি ও অন্যান্য গল্প**
দিবাকর ভট্টাচার্য
পরবাস। নিউ জার্সি- ০৭৭৩১
২২৫.০০

দিবাকরের লেখাতেও ভাব আর রূপ, শব্দ আর ধ্বনি, চিত্র আর চিত্রকল্পের এমন সর্বাঙ্গীন আদানপ্রদান চলে যে, গল্পের কথক থাকলেও, গল্পগুলি কথিকা হয়ে ওঠে না কখনওই বরং নিজস্ব এক প্রাণ নিয়ে চারিয়ে যায় শিকড়ে, উড়াল দেয় আকাশে, শব্দার্থের বহুত্বে অপরিবর্তনশীল বিশ্বাস থেকেই যেন বা গল্পের গন্তব্য-পথে বহুমুখ এঁকে রাখে। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, তোমার সম্মুখে বহুরূপে। এক ছাঁচে ঢালাই হয় না কিছুই, ভাগ্যিস হয় না।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না যখন নদীর স্রোতে রুপোর দুল, রুপোর নথ তৈরি করে রাত্রিকে সাজায় তখন এক ঘন তমসা অপেক্ষা করে বিপ্রতীপে। অপেক্ষার সংযম তাকে শক্তিশালী করে তোলে, সে তার অন্ধকারে ধারণ করে অত্যাচার ও অহঙ্কারের ইতিহাস, একাত্মতা ও আত্মীয়তার আলেখ্য। দিবাকর ভট্টাচার্যের *তথাগত মুখশ্রীটি ও অন্যান্য গল্প*-এর প্রথম তথা নাম গল্পেই আমরা তাই জীবন্ত মিথ্যার সমারোহে প্রাণহীন সত্যকে প্রাংশু হয়ে উঠতে দেখি। এই গল্পের নায়িকা মন্দিরা সিঙ্গল মাদার হিসেবে তার পুত্রকে বড় করে তোলে এমন একটি ঘরে, যে-ঘরের আগের বাসিন্দা সমীর রায় আত্মহত্যা করেছিল। সেই সমীরের ছবি প্রথমদিন চোখে পড়তেই আঁতকে উঠেছিল যুবতী মন্দিরা, কিন্তু জীবন যখন চলে গিয়েছে কুড়ি-কুড়ি বছরের পার, যখন বুকের রক্ত দিয়ে বড় করা ছেলের মাকে দেখতে আসার সময় নেই তখন সেই অকালমৃত সমীর রায়ের ছবিই হয়ে ওঠে মন্দিরার আশ্রয়, খাটের

**দিবাকর ভট্টাচার্য তাঁর জীবদ্দশায় নিজের কোনও লেখা ছাপতে দেননি তার কারণ কি এই যে, একটা স্বপ্নিল চরাচরের ভিতর থেকে তিনি সৃষ্টি করতেন কিন্তু সৃষ্টি তা সে স্বপ্নের যত কাছাকাছিই হোক না কেন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়েই আসে।**

পাশের টেবিলে রাখা ডেট ক্যালেন্ডারটার গায়ে সেই ছবিকে রেখে দেয় মন্দিরা। প্রাণহীন তবু জীবন্ত। স্পর্শযোগ্য তবু স্পর্শাতীত।

নীচ থেকে উপরে উঠে যাওয়া স্ট্যালাগমাইট আর গুহার ছাদ থেকে নীচে নেমে আসা স্ট্যাল্যাকটাইটের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে দিবাকর ভট্টাচার্যর গল্পের ফর্ম আর কনটেন্ট। তাই 'নিতান্তই পুতুলের গল্প কিংবা অনিন্দিতার কাহিনী' গল্পে অতগুলো ছোট-ছোট পর্ব থাকবে কেন? 'অনি ও রক্ষী', 'অনি ও বেহালাওয়ালা' প্রতিটি পর্বেই ছোট মেয়েটার একটা স্বপ্ন বিল্ড-আপ হচ্ছে দেখা যায়, কিন্তু পরিণামে অনিন্দিতার ভিতর আমরা আবিষ্কার করি জেমস জয়েস-এর 'অ্যারাবি'-র সেই ছেলেটাকে হতাশা আর যন্ত্রণায় পুড়ে গিয়েছিল যার হৃদয়। দিবাকর ভট্টাচার্য তাঁর জীবদ্দশায় নিজের কোনও লেখা ছাপতে দেননি তার কারণ কি এই যে, একটা স্বপ্নিল চরাচরের ভিতর থেকে তিনি সৃষ্টি করতেন কিন্তু সৃষ্টি তা সে স্বপ্নের যত কাছাকাছিই হোক না কেন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়েই আসে। আর একটি গল্প 'শাশ্বত মানসযাত্রী হংসে' যা হেরমান হেস্‌সে-র কয়েকটি রচনার দ্বারা প্রাণিত বলে লেখক নিজেই জানিয়েছেন, সেখানেও এই সৃষ্টি আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা জড়িয়ে আছে একে-অপরের সঙ্গে। দিবাকর ভট্টাচার্যের ভাষা যা একইসঙ্গে মায়াবী এবং তীব্র তার পরিচয়ও এই গল্প দু'টোয় পেয়ে যাই আমরা। প্রথম গল্পটিতে যেমন পাচ্ছি, "পাতালে শুধু অন্ধকার। সে অন্ধকার এত গভীর যে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। এমনকি নিজেকেও না। তাই ওরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। নিজেদেরকেও না। ... এ অন্ধকার এত গভীর যে এখানে কোনো সময় বোঝা যায় না। তাই এখানে কোনো ঋতু নেই।/ তাই ওদের অতীত ওরা মনে করতে পারে না। ওদের কোনো ভবিষ্যৎ ওরা দেখতে পায় না। ওদের জীবনে সময় বলে কিছু নেই।" ওই একই গল্পে আবার পাই, "অনির কাছে আজ সকালের আলোটা তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর আলো। এক স্বপ্নের রাজ্যের রানি হতে চলেছে সে। ... বাড়ির সর্বত্র সেই আলো ঝলমল করছে।" ওদিকে হেরমান হেস্‌সে-র রচনা থেকে প্রাণিত পরের

গল্পটিতে এক শিল্পী যাই সৃষ্টি করছেন তা বাস্তবোচিত না হয়ে একটি স্বর্গীয় কিছুর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। এই গল্পের গদ্য যেন খোয়া ক্ষীর। এমনই জমাট, এমনই মধুর। এখানে পড়ি, "তিনি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওই চেয়ারটির দিকে। এতকাল ধরে আয়ত্ত করা বিপুল শব্দ ও সুরের মহাসমুদ্রে তিনি ডুব দিয়ে খুঁজতে থাকলেন ওই ভগ্ন পরিত্যক্ত চেয়ারটির বর্ণনার উপযুক্ত শব্দ, যথাযোগ্য সুর। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তিনি কিছুই পেলেন না। ব্যর্থ চোখে সেই দিকে তিনি তখন শুনতে পেলেন, "কী হল কবি? তুমি নীরব কেন?" অক্ষরমালার অনন্ত নিখিলে নিবিষ্ট হয়েও তাঁর দু'হাতে এখন গভীর অভাব। তাই তিনি নতমুখে নিরুত্তর রইলেন। নিজেই নিজেকে নিঃশব্দে বললেন, "আমি এবারেও পারলাম না। কিন্তু কেন?"—এই প্রশ্নটাই অদ্ভুত শূন্যতার স্তূপের ভিতর দিয়ে দিবাকর ভট্টাচার্যকে সন্ধান করাতে করাতে নিয়ে যায়। গল্পের সন্ধান, শব্দের সন্ধান, সমগ্রতার সন্ধান। দিবাকরের লেখা পড়তে-পড়তে মনে হয়, সতী দেহত্যাগ না-করলে নাচতেন কেন শিব, পাথর ছড়িয়ে না-থাকলে লাফ দিয়ে ঝর্না সৃষ্টি করত কেন পাথর, সাধনগুহা ঘনান্ধকার না হলে ওঁকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ হত কী করে?

হোসে সারামাগোর *দ্য ডাবল* উপন্যাসে এক ইতিহাসের শিক্ষক, ভিসিআর-এ চলতে থাকা একটি সিনেমায় যাকে দেখে সেই লোকটির চেহারা হুবহু ওর পাঁচ বছর আগের চেহারার মতো। সে তখন খুঁজতে শুরু করে তার দ্বৈতকে আর খুঁজতে খুঁজতে একটি প্রশ্নের কাছেই পৌঁছয়, আমরা কি কেবল আমাদের বহিরঙ্গই, না কি আমরা আমাদের অন্তরঙ্গও বটে? সেই অন্তরঙ্গ সত্তার উন্মোচন দিবাকরের গল্পের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

'অকস্মা' নামের গল্পটিতে যেমন ছেলেকে একটা পুরনো জমকালো বাড়ি দেখাতে চেয়ে ব্যর্থ হয় বাবা। কিন্তু সেই বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পথে ছেলে আবিষ্কার করে ফেলে সেই বাড়িটা। আর তারপর, যে-বাবাকে অপদার্থ মনে করতে শুরু করেছিল, নিজেকেই আবিষ্কার করতে থাকে তার জায়গায়। নিজের বালক ছেলেকে সেই জমকালো বাড়ি দেখানোর গল্প আরম্ভ করে দেয়। 'অকল্পিত' নামের গল্পটিতেও সাংঘাতিক বাঁক। শ্রীপতি রায়ের বৈঠকখানায় দিন গুজরান করা অনাথবন্ধু মিত্র বিছে নিয়ে বলা একটি গল্পের শেষে নিজের সেই হাত বাড়িয়ে দেয় যেখানে একদম বিছের মতো দেখতে একটা পুরনো ক্ষত। না, শ্রীপতি রায়ের বৈঠকখানায় গল্প শুনিয়ে কোনও পয়সা পায়নি ভূপতি।

**গল্পগুলি সময়ের সম্পাদ্য থেকে আপনাআপনি মুক্ত হয়ে মহাসময়ে পা রাখে। মিথ, পুরাণ, দর্শন এবং ইতিহাসকে এমন অসামান্য কায়দায় ব্যবহার করেছেন লেখক যে, গল্পগুলি বারবার পড়েও আশ মেটে না।**

আরও চমকে দেওয়া একটি গল্পের নাম, 'আকাশকুসুম', যেখানে গল্পের নায়িকা রিক্তা বিকেলের আকাশে মেঘের মধ্যে একটি সিম্বল দেখে মাঝে মাঝেই, হলুদ ফুলের তোড়া। আর সেই সিম্বল দেখার মানেই কারও না কারও মৃত্যু। এই পূর্বাভাসকে প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল রিক্তার হবু স্বামী সুনন্দ। কিন্তু ধীরে ধীরে রিক্তার ওই প্রতীক দেখা এবং তারপর দু'-একদিনের মধ্যেই কারও মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে দেখে সংশয়ে আচ্ছন্ন সুনন্দও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, রিক্তার ওই পূর্বানুমান সত্য। সত্য যখন বাড়তে বাড়তে জীবনের আর সব অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞানকে মিথ্যে করে তোলে কী হয় তখন? সুনন্দ কেন থাপ্পড় মেরে বসে রিক্তার গালে? কী হয় তারপর?

'অঘোরবাস্তবের আশ্রয়ে', নামের গল্পে স্কন্ধকাটা ছেলেটি নিজের হাতে নিজের মাথা বহন করে। এই গল্প কি আজকের সময়কেই ইঙ্গিত করে না? আর এই গল্পের নাম যেন দিবাকরের লেখার ভুবনকে আন্ডারলাইন করে দেখিয়ে দেয়, যেখানে অবাস্তবও নেই, নেই ঘোর-বাস্তব; আছে অঘোরবাস্তব!

সেই অঘোরবাস্তবে শিল্প আর জীবন এমন জায়গা বদলাবদলি করে খেলে যে, কোনটা কী তা বোঝার উপায় থাকে না।

সাপ তো একটি প্রাণী, আদম-ইভ-এর উচ্ছ্বাসের মূল্য দিতে কেন তাকেই হয়ে উঠতে হবে দৈবের দুশমন? বাস্তব না-করলেও, অঘোরবাস্তব এইরকম প্রশ্ন করে। আর দিবাকর ভট্টাচার্যর গল্পগুলি সময়ের সম্পাদ্য থেকে আপনাআপনি মুক্ত হয়ে মহাসময়ে পা রাখে। মিথ, পুরাণ, দর্শন এবং ইতিহাসকে এমন অসামান্য কায়দায় ব্যবহার করেছেন লেখক যে, গল্পগুলি বারবার পড়েও আশ মেটে না। আর পড়ার পর প্রতিবারই পাঠকের গল্প-ভুবন আরও অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে যায়।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে, দিবাকার ভট্টাচার্যের *তথাগত মুখশ্রীটি* ও *অন্যান্য গল্প* এক ভীষণ জরুরি সংযোজন, শূন্যতার ভিতরে যা পূর্ণতার সন্ধান দেয়, বাজিয়ে তোলে অশ্রুত রাগিণী।